MAGAZINE

NOVEMBER 2017 TO MAY 2018

Contents

1.	নতুন দিনের গাণ	প্রসাদ রঞ্জন দাস BEC 69 (Architecture)	Page 1.
2.	রবি ঠাকুর	অমিত সেনগুপ্ত (প্রবীর সেনগুপ্তর ভাই)	Page 2-6.
3.	তাম্বি	অমিত সেনগুপ্ত (প্রবীর সেনগুপ্তর ভাই)	Page 7-9.
4.	মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন	অভিজিৎ দাস (অশোক দত্তের বন্ধু)	Page 10-15.
5.	বিবেকানন্দের বিশ্বজয়	অমিত সেনগুপ্ত (প্রবীর সেনগুপ্তর ভাই)	Page 16-19.

[illegible] নতুন দিনের গান ॥

: রঞ্জন প্রসাদ ॥

[একটি বছর পার হয়ে / নতুন দিন আসে
একটি হারানো পারাবত / আকাশে ভাসে] ch

পুরানো বছর স্মৃতি নিয়ে যাক দূর
(জীবনের গানে) বাজুক নতুন সুর
কেউ গিয়েছে দূরে আর / কেউ এলো পাশে
(Repeat ch) .... (একটি হারানো)

পিছনে থাকুক যত গ্লানি পরাজয়
নতুন বছর হোক মঙ্গলময়
উজ্জ্বলে হোক আগামী দিন / ভরুক উচ্ছ্বাসে
(Repeat ch) (একটি হারানো) ....

(Fade out with ch .....)

রঞ্জন প্রসাদ ॥

Regent Park
29 Dec 2017
Kolkata - 700 040

রবি ঠাকুর

অমিত সেনগুপ্ত
(অকল্যান্ড)

‘তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে কোলকাতার নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় উচ্চারিত এই উক্তিটিতে তাঁর সম্পর্কে বাংলা ও বাঙালীর মনের কথাটি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তেমনটি বোধহয় আর কখনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সত্যিই এক পরম বিস্ময়। আমাদের গভীরতম অনুভূতিকে আমরা যেভাবে মনের নাগালে পাই, ভাষার নাগালে সেভাবে সবসময় পাই না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার সেই অবস্থাই হচ্ছে। মনের গভীরতম অনুভূতিতে তাঁকে যেভাবে পেয়েছি, তার প্রকাশসাধ্য ভাষা আমার নেই।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি পৃথিবীতে হয়তো জন্মেছেন। তার চাইতে বড় নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিক নিশ্চয়ই জন্মেছেন। একথা মেনে নিয়েও বলতে আমার দ্বিধা নেই যে কাব্যে, নাট্যে, গল্পে, উপন্যাসে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, ধর্মচিন্তায়, জাতিগঠনে, বিশ্বমানবের ঐক্যসাধনে - একজন ব্যক্তি কোনো দেশের সাহিত্য, কলা এবং জীবনে এতটা স্থান অধিকার করেননি। প্রতিভার কোন কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের থেকে কৃতী ব্যক্তির সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং গ্যয়টে ছাড়া আর কারো সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে না। এবং সামগ্রিক বিচারে রবীন্দ্র-প্রতিভা পৃথিবীর যে কোন প্রতিভাকে অতিক্রম করেছে।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় নাটক দেখে খুব নিরাশ হয়েছিলেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। বন্ধুকে বলেছিলেন, ‘এই তোমাদের নাটক? রোসো, আমি লিখে দিচ্ছি।’ লিখলেন নাটক। একদিকে ট্র্যাজেডি, অপরদিকে কমেডি - এর কোনটাই আমাদের সাহিত্যে ছিল না। বাংলা সাহিত্যে সনেটের সৃষ্টি করলেন। গতানুগতিক ছন্দ থেকে বাংলা কাব্যকে অমিত্রাক্ষরে মুক্তি দিলেন। বাংলা কাব্য সাবালক হল।

রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সব্যসাচী। উপন্যাসে, সমাজবিজ্ঞানের প্রবন্ধে, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায়, সাহিত্য সমালোচনায়, রসরচনায় সিদ্ধহস্ত ও পথপ্রদর্শক। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা কাব্য, সাহিত্য নবযুগের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তারপর এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বসাহিত্যের সুরের সাথে বাংলা সাহিত্যের সুরটি মিলিয়েছেন। সাহিত্যদেবীকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বলেছিলেন, ‘তোমার বিশ্বসাহিত্যের সুরের সাথে আমার বাংলা সাহিত্যের সুরটি

মিলিয়ে নাও।' রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে আমরা বিশ্বসাহিত্যের রূপ দেখতে পেয়েছি। বর্তমানে পৃথিবীতে যে পাঁচ-ছয়টি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য আছে, বাংলা সাহিত্য তাদের সমকক্ষতা দাবী না করলেও তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলার সাহস অর্জন করেছে। আগে যা অসম্ভব ছিল, আজ তা সম্ভব হয়েছে। এই শক্তির সঞ্চারে রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বাধিক।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল - তিনি শুধু সাহিত্যই সৃষ্টি করেননি, সাহিত্যিকও সৃষ্টি করেছেন। ভাষার দৈন্য দূর করে সাহিত্যের রাজপথ নির্মান করেছেন। রাজপথে কেবলমাত্র রাজার রথই চলে না, পদাতিকেরও চলার অধিকার আছে। এই রাজপথে পদাতিকের চলাচল যত বেশী বাড়বে রাজপথের গৌরবও তত বেশী বাড়বে। চলাচলের সমস্ত বাধা তিনি দূর করে দিয়েছেন। অগ্রগতিতে আর কোন বাধা নেই। রবীন্দ্র পরবর্ত্তী কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, চিত্রাঙ্কণে, সঙ্গীতে নতুন নতুন অভিযান সেই বাধাহীনতাই প্রমাণ করেছে। তিরিশের দশক থেকে আশির দশক এই পঞ্চাশ বছরকে আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলা হয়। অতুলপ্রসাদ, নজরুল ও অন্যান্য কবির গান এবং আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ এই রবীন্দ্রসৃষ্ট রাজপথেই হয়েছে এবং এই বিকাশের পিছনেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও অবদান রয়েছে। শিবের জটায় আবদ্ধ থাকাকালীন গঙ্গা পুণ্যসলিলা ছিলেন না - জটা মুক্ত হয়েই পুণ্যসলিলা হয়েছেন। রবীন্দ্র প্রতিভাও বাংলা সাহিত্য-কলা-সঙ্গীত বিকাশের রাজপথ নির্মাণ করে,অগণিত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে।

আমাদের সাহিত্য এবং ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে ইংরাজী সাহিত্য প্রায় চার-পাঁচশ বছরে ছোট-বড়-মাঝারি বহু লেখক এবং সাহিত্যিকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। আর বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় প্রতিভাবানের প্রচেষ্টায় কয়েক বছরে। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ শুধু একশো নয় - এক অক্ষৌহিণী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য, কাব্য, কলা, সঙ্গীতকে এমন স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন যেখানে সে তার আপন পথ আপনিই করে নিতে পারবে।

সমাজে দুই ধরণের ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যায় - প্রথাগত ঐতিহাসিক এবং অপ্রথাগত ঐতিহাসিক। প্রথাগত ইতিহাস লেখেন পন্ডিত ব্যক্তিরা আর অপ্রথাগত ইতিহাস লেখেন রসিক ব্যক্তিরা। প্রথম জনের কাজ রাজ্যের ভাঙাগড়া নিয়ে এবং দ্বিতীয় জনের কাজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে। এই দ্বিতীয়টিই জাতির সত্যিকারের ইতিহাস। এখানেই থাকে মানুষের কান্না-হাসি, রাগ-রঙ্গ, হিংসা-বিদ্বেষ, স্নেহ-ভালবাসার কাহিনী। তা থেকেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। প্রথাগত ইতিহাস হাত-পা ছোঁড়াটাকেই দেখে। অপ্রথাগত ইতিহাস শুধু হাত-পা ছোঁড়াটা দেখেই ক্ষান্ত হয় না - কান পেতে তার হৃদ্-স্পন্দনও শোনে। ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে যা লিখছেন তার কিছুটা উল্লেখ করছি।

'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে- ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে - পাঠান-মোগল পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ... ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে। ... ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্ব্বপ্রধান ঘটনা তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না - সেদিনও সেই ধূলি সমাছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে জন্মমৃত্যু-সুখ দুঃখের যে প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে সেই ঝড়টাই প্রধান ... কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, সে বাহিরে। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না। ... মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্গার-কাল পর্যন্ত যাহা কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা মাত্র ... তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি?'

দেশের কাব্য সাহিত্যই দেশের প্রকৃত ইতিহাস। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস হোমারের কাব্যে, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রামায়ণ-মহাভারতে। শেক্সপীয়রের রচনায় ইংল্যান্ড ও ইংরাজ চরিত্রের যা পরিচয় পাওয়া যায়

ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-সংমিশ্রণ, রীতি-নীতি, সংস্কার-ধ্যানধারণায় যে জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠে, সাহিত্যিক কবিরা সেই চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলেন তঁদের সাহিত্যে, কাব্যে। সাহিত্যিক কবিরাই দেশের সত্যিকারের ইতিহাসকার। যে কারণে হোমার, বাল্মীকি, বেদব্যাস, শেক্সপীয়রকে দেশের ইতিহাসকার বলা যায়, সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকার। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন, সমস্ত ভারতবর্ষের মুখপাত্র। ভারতবর্ষকে জানতে হলে রবীন্দ্রনাথকে জানা এবং রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখা প্রয়োজন।

কোন সংকটমুহূর্ত্তে জনচিত্ত যখন বিশেষভাবে আলোড়িত হয়, তখন চৈতন্য, নানক, কবীরের মত মহাপুরুষ অথবা নেপোলিয়ন, গান্ধী, ম্যান্ডেলার মত রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব কোন বিচিত্র বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। মহাকবির জন্ম বা আবির্ভাব এমন ভাবে হয় না। মানুষের শিরায় শিরায় যেমন বহু পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত, মহাকবির মনেও তেমন বহুযুগের ইতিহাস স্পন্দিত। দেশের ও জাতির মনের সঙ্গে মহাকবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে দেশের চিরন্তন মনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিলিতিয়ানার জোয়ার এসেছিল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর। রবীন্দ্রনাথের পিতা সেই হিন্দু কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। সাহেবিয়ানার পীঠস্থানে শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও সাহিবিয়ানা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। তিনি তাঁর পরিবারে শিক্ষার যে পরিবেশটি রচনা করেছিলেন তাতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেও বিলিতিয়ানাকে এতটুকুও প্রশ্রয় দেননি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলনে যে আধুনিকতার সৃষ্টি হোল, তার জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। আধুনিকতার বঙ্গীয় সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথের বাল্য শিক্ষা হয়েছে এই রীতিতে। সেই কারণেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত একান্ত আধুনিক মানুষ হয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের চিরন্তন মনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলেন। গাছ যেখানে ডালপালা ছড়িয়ে দেয় সেখান থেকে সে আলো-বাতাস-সূর্য্যতাপ ইত্যাদি গ্রহণ করে। কিন্তু মাটির তলায় থাকে তার শিকড় - সেখান থেকে সে রস গ্রহণ করে। শিকড় উপড়ে নিলে আলো-বাতাস-সূর্য্যতাপ তাকে বাঁচাতে পারে না। মনের বিকাশ আর পরিপুষ্টির জন্য দেশের সংস্কৃতি রসের কাজ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং অন্য কোন পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথকে এই শিকড় থেকে, দেশের চিরন্তন মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারেনি। যৌবনে জমিদারী পরিচালনার ভার পড়ায় সত্যিকারের দেশকে দেখার সুযোগ পেলেন তিনি। দেখলেন বাংলা দেশের শস্যশ্যামলা মূর্তি, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, গঙ্গা-পদ্মার তীরবর্তী গ্রাম আর দেশের অসহায় মানুষকে। জানলেন মানুষের জীবন যাত্রা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাষা, সংস্কার, বিশ্বাস, তাদের দেবদেবী, পালাপার্বণ, আর শুনলেন এ সবকিছুর হৃৎস্পন্দন। এই সবকিছুর প্রতিই তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি ছিল। বঙ্গলক্ষ্মীর এই অপুর্ব শোভা তাঁকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল বলেই কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাই দেশের চিরন্তন মনের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন করতে পারে নি। বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দেশকে, দেশের সংস্কৃতিকে গভীরভাবে ভালবেসে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ সে যুগে দেশের অতীতকে, দেশের সংস্কৃতিকে উপহাস করা যত সহজ ছিল, শ্রদ্ধা করা ততটা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি, দেশের সংস্কৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের নির্বিচার দেশপ্রেমের আনুগত্য নয়, তাঁর কবি মনের স্বাভাবিক প্রবণতা।

দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা না করে কোন কবি মহাকবি হতে পারেন নি। এমন কি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট যে মাইকেল, তাঁকেও হোমার, দান্তে, শেক্সপীয়র ছেড়ে বাল্মীকির স্মরণাপন্ন হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কখনও দেশবাসীর সামনে দেশের অতীত গৌরবকে তুলে ধরেছেন, কখনও দেশমাতৃকার অন্তরের বেদনা ব্যক্ত করেছেন। সমস্ত কবির মুখেই অতিশয়োক্তি শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের মুখেও তা শুনেছি। ভারতমাতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি যখন বলেছেন - 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন' - তখন হয়তো অন্নের জন্য পরের দ্বারে ধরণা দিতে হত। যখন বাংলা মাকে বলেছেন 'সোনার বাংলা' তখন হয়তো অর্দ্ধেক লোক পেট ভরে খেতে পেত না। তবে কি তিনি মিথ্যে বলেছেন? মোটেই নয়। অত্যুক্তি ভালবাসার ধর্ম। তিনি দেশের প্রতি যে ভালবাসা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে কোন কৃপণতা নেই, আছে শুধু গভীরতা। কোন সন্তানই তার মাকে ছোট করে দেখে না।

লোক-সঙ্গীত কথা-প্রধান এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সুর-প্রধান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অসামান্য পান্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ স্বদেশী গানে সাধারণ মানুষের পরিচিত লোক সঙ্গীতের সুর-সংযোজনা করেছিলেন। স্বদেশী

আন্দোলনের যুগে তিনি যে চারণ কবির ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন এবং আন্দোলনকে তাঁর গান দিয়ে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, এটা তার একটা মুখ্য কারণ। বাউল, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী সুর ইত্যাদি দিয়েই তিনি তাঁর অধিকাংশ স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তার আপন মনের কথা, তার আপন ভাষা, আপন সুরে শুনতে পেয়েছিল। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল থেকে সে সঙ্গীত বেজে উঠেছিল। মনের গভীরতম সুখ-দুঃখ, অনুভূতি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ ভাষা হল গান। কবিকেই তা সৃষ্টি করতে হয়। সুর যেখানে কথাকে পোঁছে দিতে পারে, কথা পায়ে হেঁটে সেখানে পোঁছাতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসঙ্গীতজাত গান এত সহজ স্তরে পোঁছে দিয়েছিলেন যে সে গান পথ চলতে, কাজ করতে, প্রেম নিবেদনে, দেশ প্রেমে, গৃহকার্য্যে, বিপ্লবে, বিদ্রোহে, পূজায়, দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে, প্রকৃতির উদ্দেশ্যে কিছু বলতে - সব কাজে মানিয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গানেই সর্বপ্রথম কথা ও সুর সমান প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাই নয় হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালগুলির সীমানা অতিক্রম করে তিনি সাতটি নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষাকে পুঁথির গন্ডী থেকে, ধর্মকে শাস্ত্রের বন্ধন থেকে, রাজনীতিকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে এবং সঙ্গীতকে ওস্তাদি ও কালোয়াতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম আমাদের শেখালেন গান ছাড়া কোন অনুষ্ঠান হয় না। বিয়ের শুধু মন্ত্র ছিল, গান ছিল না। এখন গান ছাড়া কোন বিয়ের অনুষ্ঠানই জমে না। জন্মোৎসব থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সব কিছুর জন্যই তিনি গান রচনা করেছেন। তঁর গান 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গেয়ে বাঙ্গালী বীর ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর 'এই কথাটি মনে রেখো' গানের আইরিশ অনুবাদ গেয়ে আয়ারল্যান্ডের দুইজন বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন। রাজনীতির রূপ সাধারণত কুৎসিত। সেখানেও যে সৌন্দর্য্য আনা যায়, বাংলাদেশই তা প্রমাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানই তার পথ নির্মাতা। সেই পথেই নজরুলের গানের যাত্রা এবং অগ্রগতি হয়েছে।

রাজনৈতিক হট্টগোলের মধ্যে যিনি সুরসংযোজনা করতে পারেন, সেই মানুষ যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, সঙ্গীতই যে তার বিদ্যা-আহরণের প্রধান বাহন হল তাতে আর আশ্চর্য্য কি। বিদ্যালয়ের কাজকে যেমন তিনি গানের সুরে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, গ্রাম সংগঠনের কাজেও সঙ্গীতকেই তার বাহন বানিয়েছিলেন। গানকেই করেছিলেন তাঁর সমস্ত কাজের সহায়। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'গানের বেলায় যে গলা মিলাতে পারবে, কাজের বেলাতেও সে হাত মিলাতে পারবে।' কোন জোর খাটাতে যান নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল - 'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।'

আমাদের স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা বেশী দিনের নয়। রবিঠাকুর নিজেই দুঃখ করে বলেছিলেন তাঁদের জন্ম হয়েছিল নারীহীন সমাজে। নারীহীন সমাজ যে কতটা নীরস-নিস্প্রাণ তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি জানতেন মেয়েদের অনুপস্থিতিতে ছেলেরা নিজেদের রুচি সম্পর্কে খুব একটা সচেতন থাকে না। শ্লীলতা-শোভনতা সব সময় বজায় রাখে না। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। ছেলে-মেয়েদের স্বচ্ছন্দ মেলামেশার পরই কথা-বার্ত্তা, আলাপ-আলোচনায় সতর্কতা বৃদ্ধি পেল - জন্ম হল মার্জিত হিউমারের। সেই জন্যও রবিঠাকুরের কাছে আমরা অনেকটা ঋণী। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভদ্রসমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমবেত সঙ্গীত বা কোরাস গান প্রচলন করেছেন।

সাহিত্যিক ও কবিরাই দেশের ও জাতির সবচেয়ে বড় শিক্ষক। রামায়ণ-মহাভারতের কবি আমাদের আদি গুরু। সাহিত্যিক ও কবিরা সাহিত্য ও কাব্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ ও জাতিকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথই পৃথিবীর একমাত্র কবি যিনি শুধু সাহিত্য ও কাব্য দ্বারা পরোক্ষভাবে নয়, বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছেন। বালক বয়সে স্কুলে যাবার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সারা জীবন তাঁর মনে ছিল। স্কুল যাওয়ার নাম দিয়েছিলে দ্বীপান্তর বাস। তিনি ছিলেন 'ইস্কুল পালানো ছেলে'। সেই ইস্কুল পালানো ছেলে বড় হয়ে নিজেই একটা ইস্কুল খুলে বসলেন। শান্তিনিকেতনের সব চাইতে বড় পরিচয় হল - এটা ইস্কুল পালানো ছেলের নিজহাতে গড়া স্কুল। এমন স্কুল বানাতে চেয়েছিলেন যেখানে ছেলেরা বাড়ি পালিয়ে স্কুল আসবে। হয়েছিলও তাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ঠ হল শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আনন্দ দান। ইস্কুল পালানো ছেলের নিজহাতে গড়া স্কুলের শুধু প্রকৃতি নয়, তার আকৃতিও পালটে গেল। স্কুল বসল গাছের তলায়। গাছের ডালে ডালে যেখানে পাখি গান গায়,

গাছে গাছে যেখানে ফুল ফোটে - সেখানে মাষ্টার মশাইয়ের কর্কশ স্বর নিজের অজান্তেই নরম ও সুরেলা হয়ে যায়। পড়াশোনার মধ্যে সুর আর রঙের ছোপ লেগে যায়।

ছাত্রছাত্রীদের তিনি খোলা মাঠে ডেকেছেন 'ছুটির নিমন্ত্রণে'। পাঠ্য বইয়ের নাম দিয়েছেন পাশের পড়া নয়, 'ছুটির পড়া'। পড়া, কাজ আর খেলা এই তিনের ব্যবধান তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত ক্ষ্যাপামিকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। তিনিই নাটের গুরু, ছেলে ক্ষ্যাপানোর সর্দার। এই ছেলেমেয়ের দল তাঁর চারিদিকে না থাকলে 'ফাল্গুনী' লেখা হত না। সেই দিক দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই বিরাট সৃজনশীল কাজের অংশীদার। রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনকে গড়েছেন, শান্তিনিকেতনও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বললেন - 'ছাত্রছাত্রীদের শুধু ভালবাসলেই হবে না, তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। ছেলেদের আমরা নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে করি, কোন কাজেই ডাকি না। তাদের সহযোগিতা দাবি করি না। ... এরা কোন ব্যাপারে মালিকানা তো দূরের কথা, শরিকানা-স্বত্ত্বও অনুভব করে না। ফলে জীবনকে, দেশকে এরা ভালবাসতে শেখে না। দেশের মাটির সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য - দেশকে গড়ে তোলা - তা সম্ভব নয়।' 'ওদের (সাধারণ মানুষের) মুখে দিতে হবে ভাষা।' সে ভাষা মুখস্থ করা ভাষা নয়, ধাতস্থ করা ভাষা। ভাষা বলতে উনি এখানে শিক্ষার কথা বলেছেন। বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। বিদ্যালাভ (মুখস্থ বিদ্যা) করলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না, বিদ্যা যখন ধাতস্থ হয় তখনই তাকে বলা হয় শিক্ষা। শিক্ষার ইমারত তিনি নিজ হাতে গড়েছিলেন। প্রয়োজনে গড়া জিনিষ ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন। পরবর্ত্তীকালে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীকে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাজনৈতিক নেতাদের মত স্বদেশী আন্দোলনে তিনি কোন দিনই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু প্রথম দিকে কোলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন গুলিতে তিনি যোগদান করেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি রচনা করে নিজেই গেয়েছিলেন। এই অধিবেশনেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটিতে সুরসংযোজনা করে তিনি গেয়েছিলেন। তবে কংগ্রেসী রাজনীতিতে কোনদিনই তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না, যদিও বিভিন্ন কংগ্রেসী সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল - 'ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই। ভিক্ষা স্বরূপ যতই অধিকার লাভ কর অন্তরের লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইবে না।' রাজনৈতি ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করতেন। রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা না নিলেও ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের জঘন্য হত্যাকান্ডের পর প্রকাশ্যে জ্বলে উঠছিলেন বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। তার কয়েক বছর আগেই বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সম্মান ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন। তখন তিনি লিখেছিলেন, 'দেশের মানুষকে যারা সম্মান দিতে শেখেনি, তারা এসেছে আমাকে সম্মান দিতে। এদের দেওয়া সম্মানের মূল্য কি?' রাজশক্তিকে উপহাস করে তিনি আরও লিখেছিলেন - 'দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ, নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে, সে আমারে গৃহ করে দান!'

স্বাধীনতার আগে দেশে বিদেশে স্বাধীনতার অনুকূলে মত গঠনের প্রয়োজন ছিল। সে কাজ রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বেশী করেছেন। বক্তৃতা করে নয়, নিজ ব্যক্তিত্ব দ্বারা। দেশে বিদেশে জ্ঞানী গুণীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন - যে দেশে এরকম মানুষের জন্ম হয়েছে, সে দেশ কিভাবে পরাধীন থকতে পারে? যারা সে দেশকে পরাধীন করে রেখেছে তারাই বা সভ্যতার দাবী করে কি ভাবে? পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মুখে বারবার শোনা গেছে - 'ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সৃষ্টি-কর্ত্তার এক কৌতুক বিশেষ। এ হেন ব্যক্তির জন্ম ইউরোপে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।' আমেরিকান পন্ডিত উইল ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন - 'You are the reason why India should be free.'

আবির্ভাবকালে মহাকবি দেশের সংস্কৃতিকে যে অবস্থায় লাভ করেছিলেন তিরোধানকাল পর্যন্ত আপন সম্পদ দিয়ে তিনি সেই সংস্কৃতির অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি করে যান। তাঁর আবির্ভাবকালে আমাদের সংস্কৃতি সবেমাত্র মধ্যযুগের চৌকাঠ পার হয়েছিল। তিনি একশো ঘোড়ার রথ চালিয়ে সেই সংস্কৃতিকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসম্ভারে পুষ্ট বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির অংশীদার, কারণ বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারে সে অনেক কিছুই দিয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির কাছে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঋণী, বাংলা সংস্কৃতিও তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ভীষণভাবে ঋণী। সার্ধশতজন্মবর্ষের প্রাক্কালে এই মহাকবিকে প্রনাম জানাই।

তাম্বি

অমিত সেনগুপ্ত

(নিজের অভিজ্ঞতা, কিছুটা শোনা এবং কিছুটা কল্পনায় লেখা এই গল্পটা)

সেপ্টেম্বর, ১৯৭২। তখনও আমার বয়স চব্বিশ হয়নি। হবে হবে করছে। নকশাল পিরিওড। আমার নামে পুলিশের হুলিয়া। দিল্লীতে তখনও শীত পড়েনি। বোম্বে থেকে দেরাদুন মেল পুরানো দিল্লী রেলওয়ে স্টেশন এসে পৌঁছয় রাত্রি দশটায়। রাত্রি দশটা বেজে কুড়ি মিনিটে দিল্লী থেকে ছেড়ে, রাত্রি দুটোর সময় সাহারানপুর পৌঁছয় । সেটাই schedule time। আমি সাহারানপুর যাব। আমার প্ল্যান অনুযায়ী সাহারানপুরে রাত্রিটা কাটিয়ে, সকাল বেলায় বেহেটের বাস ধরে বেহেটে যাব। সাহারানপুর থেকে বেহেট মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে হলেও, পার্বত্য রাস্তা দিয়ে সেখানে পৌঁছতে প্রায় তিন-সারে তিন ঘন্টা সময় লাগত। তবে আমার ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটির কলিগ, প্রদীপ বন্সলের কাছে শুনেছি, এখন নাকি রাস্তা খুব ভাল হয়ে গেছে, কাজেই এখন আর অত সময় লাগে না। প্রদীপ বেহেটের বাসিন্দা।

রাত্রিটা কোনমতে সাহারানপুরে কাটাতে হবে। সানু তখন সাহারানপুরে ছিল। আমাদের প্ল্যান ছিল হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, রাজনৈতিক বেস এরিয়া বানানোর। সেই অনুযায়ী আমরা প্রায় দশজন কমরেড, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় settle করার চেষ্টা করছিলাম। আমার জন্যে (স্থান/জায়গা) ঠিক হয়েছিল বেহেটে। আমি প্রথমবার সাহারানপুর আর বেহেটে যাচ্ছি।

দেরাদুন মেল পুরানো দিল্লী স্টেশনে পৌছনোর আগে পুলিশের ভয়ে আমি স্টেশনে ঢুকিনি, পাছে পুলিশ দেখে ফেলে। সেই সময় স্টেশনে খুব চেকিং ও খুব ধর-পাকড় হোত। আমি স্টেশনের বাইরেই ভীড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিলাম ট্রেন আসার অপেক্ষায়। ট্রেন পুরানো দিল্লী স্টেশনে সময় মত এসে পৌঁছে আমাকে খুব অবাক করে দিল। কারন তখন আমাদের দেশে সমস্ত ট্রেনই দেরীতে যাতায়াত করত (এখন কি অবস্থা জানিনা)। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। আমার হাতে ছিল একটা সুটকেস, যাতে ছিল কিছু নকশাল documents, কয়েকটা মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সেতুঙ্গের বই আর আমার জামা-কাপড়।

সানুর কাছে শুনেছিলাম সাহারানপুরে রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে শোবার জন্যে খাটিয়া ভাড়া পাওয়া যায়। যেহেতু আমার ট্রেন রাত্রি দুটোয় সাহারানপুর পৌঁছবে এবং আমি সকাল নটার আগে বেহেটের বাস পাবনা, তাই বেশ কয়েক ঘন্টা সাহারানপুর শহরেই কাটাতে হবে। তখন নকশাল পিরিয়ডে আমাদের হাতে/পকেটে বেশী পয়সা থাকতো না। (অবশ্য এখনও সেই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি)। কাজেই সেই রাতটা সাহারানপুরের কোনও হোটেলে থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। তাই তিন-চার ঘন্টার জন্যে খাটিয়া ভাড়া করার কথা আমি ঠিকই করে নিয়ে ছিলাম। চার ঘন্টার জন্যে খাটিয়ার ভাড়া - দুটাকা। অবশ্য সানুর কাছে এও শুনেছি সেই খাটিয়াতে বাস করে পরিবার সহ স্ববান্ধবে ছারপোকার গুষ্টি। তাই আমার চিন্তার মধ্যে ছারপোকার পরিবার ঘোরাঘুরি করছিল, কারন রাতটা যে খাটিয়া ভাড়া করে ছারপোকার সঙ্গে শুতে হবে তা মোটামুটি স্থির/ঠিক করে নিয়েছিলাম।

ছাড়পোকার কথা চিন্তা করতে করতে রাত্রি দশটা বেজে দশ মিনিটে স্টেশনে ঢুকেই দেরাদুন মেলের একটা কামড়ায় ঢুকে পড়লাম। আমি চাইছিলাম ভীড় কামড়ায় ঢুকতে। কেননা ভীড় কামড়ায় গা ঢাকা দেওয়া অনেক সহজ। কিন্তু কেন জানিনা, সেইদিন ট্রেনটা মোটামুটি খালিই ছিল।

আমার কুপেতে, যেটা সাধারনত আটজন বসার জায়গা, সেখানে ছিলাম মাত্র দুজন। আমি আর খুব attractive, শ্যামলা-বর্না সাউথ ইন্ডিয়ান একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স চৌত্রিশ-পয়ত্রিশ মত হবে। তবুও পূর্না যৌবনা শরীর। খুব সুন্দর ও মানাসই মেকআপ করেছিল। হালকা সবুজ শাড়ী। তাতে গাঢ় সবুজ পাড়। পাড়ের রঙেরই হাতকাটা সবুজ

ব্লাউজ। কপালে সবুজ রঙের টিপ। গলার হার, কানের দুল ও হাতের চুড়িগুলোও সবুজ রঙের। অবশ্য ঠোঁটের লিপস্টিক সবুজ ছিল না। ঠোঁটে ছিল হালকা পিঙ্ক রঙের লিপস্টিক। মেয়েটি যে সাজতে জানে তা মানতেই হবে। এক কথায় বলা যায় She was looking very very beautiful, attractive and sexy। আমি স্বাভাবিক ভাবেই জানলার ধারে বসে ছিলাম, ও ও ঠিক আমার সামনা সামনি জানলার ধারে বসে।

মেয়েটি আমাকে দেখে, আমার দিকে তাকিয়ে, প্রথমেই যেন একটু চমকে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। যেন আমাকে চেনে। এমন ভাব। যেন যাকে খুঁজছিল তাকেই আমার মধ্যে পেয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষন অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন। প্রথমে ভাবলাম ও বোধ হয় পুলিশের লোক এবং আমার কোনও ছবি হয়তো ওর কাছে আছে। সেই সময় যদি কোনও নকশাল নেতাকে ধরার বা follow করার দায়িত্ব কোনও পুলিশ অফিসারকে দেওয়া হোত, তাহলে তাকে সেই নকশাল নেতার photo provide করা হত। আমি ভাবলাম ওর কাছে নিশ্চয়ই আমার ফটো আছে। আবার ভাবলাম, না, পুলিশের লোক তো কখনই এত সুন্দরী হতে পারেনা। তা হলে হয়তো ও CIA-র agent হবে। আমাদের তখন ছিল এই ধরনের ছেলেমানুষী চিন্তা। অনেককেই পুলিশের বা CIA-এর এজেন্ট ভেবে বসতাম। আবার ভাবলাম ওর বোধ হয় আমাকে ভাল লেগেছে। এটা ভাবতেই আমার বেশী ভাল লাগছিল। তাই সেই ভাবনাটাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগলেও, ধরা পরার ভয়টাও কিন্তু পুরোদমে উপস্থিত ছিল।

মাঝে মাঝে মৃদু হাসছে। আবার কখনও যেন খুব দুঃখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, এমন ভাব যেন আমি কোনদিন ওকে betray করেছি বা আমি যেন ওকে অবহেলা করছি, এমন ভাব ওর চোখে-মুখে এবং body language-এ। এখনও আবার আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

এক নিমেষে ছারপোকার কথা মাথা থেকে উধাও হয়ে গেল। আর আমার মাথায় ঘুরতে থাকল শুধু দুটো চিন্তা। হয় মেয়েটা CIA অথবা পুলিশের এজেন্ট আর নয়তো আমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে এবং আমার প্রেমে পড়তে চাইছে। প্রেমের কথা নিয়ে চিন্তার পরিনাম হিসাবে, স্বপ্নিবিলাশী আমার মাথায় আনাগোনা করতে লাগলো দুষ্টু বুদ্ধি। সঙ্গে অবশ্য ভয়ও ছিল। ওই – ওই আবার এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাসছে। আমি ভাবলাম, আমিও এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকব, দেখি ও কতক্ষন তাকিয়ে থাকতে পারে? আমি জানতাম কারোর পানে একদৃষ্টে অনেকক্ষন তাকিয়ে থাকা খুব সহজ নয়। যদিও আমি মনে করতাম যে আমি তা পারি। কিন্তু কিছুক্ষন পরে আমিই হেরে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মাথায় কিছু শয়তানি/দুষ্টু বুদ্ধি তো ছিলই। সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জপ করতে আরম্ভ করলাম। (আমি নকশাল রাজনীতি করতাম বটে, কিন্তু ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আমার আজীবন ছিল। যদিও আমার কমরেডদের সে সমন্বে কোনদিনই কিছুই জানাই নি।) সেই দুষ্টুবুদ্ধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জপ করেও কিছু ফল হোল না। বরঞ্চ সেই দুষ্টু বুদ্ধি আরও বেশী করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। স্বপ্ন-বিলাসী মন আমার। ওর সম্বন্ধে ওকে নিয়ে নানা রকম দিবা-স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। মনে মনে মেয়েটাকে কাছে পেতে চাইছিলাম। যদিও মেয়েটা আমার থেকে বয়সে অনেক বড় ছিল, but that doesn't matter। মেয়েটা আবার আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমিও সেই চেষ্টা করলাম। আবার unsuccessful। এইবার একবার ওর দিকে তাকিয়ে, অন্ধকার জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে, আস্তে করে চোখ মেরে দিলাম। ও ভীষন হেসে উঠলো। তারপর আমাকে হেসে জিজ্ঞেস করল, আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি একটু ঘাবরে গিয়ে সাহারানপুরের কথা বললাম। ও জানাল, ও সাহারানপুরে থাকে। সাহারানপুরে ।ITC-তে চাকরী করে। দশ দিনের ছুটিতে বোম্বে গিয়েছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। ততক্ষনে আমাদের ট্রেন রুরকী এসে পৌচেছে। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে-বারোটা।

প্ল্যাটফর্মে 'চা-এ গরম' বলে চা-ওয়ালা হাঁক দিচ্ছিল। চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে ও না বলল। আমি এক কাপ চা কিনে খেতে শুরু করলাম আর একটা চারমিনার সিগারেট ধরালাম। আমার সিগারেট ধরানো দেখে ও যেন প্রথমে একটু রাগ ভাব দেখিয়ে, অবাক হোল। তারপর মৃদু হাসল। এর পর আমাদের মধ্যে কথা-বার্তা-আলাপ শুরু হোল। আমার নাম জিজ্ঞেস করায় আমি নাম জানালাম দীপক সিনহা। (সাহারানপুরে আমি এই নামেই পরিচিত ছিলাম। অবশ্য এই সমাজে আমি এখন যেই নামে পরিচিত সেই নাম, অমিতও আমার আসল নাম নয়।)। ওর নাম বসুন্ধরা। সাহারানপুরে আমি কতদিন থাকব, কি প্ল্যান ইত্যাদি জিজ্ঞেস করায়, আমি বেহেটের কথা না জানিয়ে, বললাম রাতটা সাহারানপুরে কাটিয়ে সকালে বাসে করে হরিদ্বার যাব। ও তখন মুচকি হাসল। কারন এই ট্রেনটাই যে হরিদ্বারে যায়, তখন সেটা আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু সাহারানপুরে

থাকে বলে ও সেটা খুব ভাল ভাবেই জানত। সাহারানপুরে রাত্রিটা আমি কোথায় থাকব জিজ্ঞেস করায় আমি জানালাম তা এখনও ঠিক করিনি। তখন ও আমাকে বলল আমি চাইলে রাত্রিটা ওর বাড়িতে থাকতে পারি। জিজ্ঞেস করে জানলাম ও বাড়িতে একা থাকে এবং ও অবিবাহিতা। আমার দুষ্টু বুদ্ধিও আরও বেশী করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। স্বপ্নবিলাশী আমি, নানা রকম স্বপ্নে মশগুল হয়ে গেলাম। আবার ভয়ও লাগছে এই ভেবে যে ও যদি পুলিশের লোক কিম্বা CIA-এজেন্ট হয়? তবে রাত্রিটা ওর বাড়িতে থাকলে ছারপোকার কামড় থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। ভাবলাম, চলো 'যো হোগা সো দেখা জায়গা'। একটা risk নিয়েই দেখি না কি হয়। যদিও যেই risk-টা নিতে যাচ্ছি, সেটা ছিল ভীষন dangerous। আপাতত দুষ্টু-বুদ্ধিরই জয় হোল। ওর বাড়িতে রাত কাটাতে রাজি হয়ে গেলাম। কোথায় ছারপোকার সঙ্গে শোয়া আর কোথায়---???-র সঙ্গে?

অবশেষে প্রায় রাত্রি দুটোর নাগাদ আমাদের ট্রেন সাহারানপুর স্টেশনে এসে পৌছালো। সাহারানপুর এমন একটা সহর যেটা চব্বিশ ঘন্টা সমান ভাবে জেগে থাকে। সারা শহরটা যেন রাত্রি বেলাতেই বেশী করে জেগে থাকে। শের-শাইরী-কাওয়ালী চলছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়। ভারতবর্ষে এই-রকম active জেগে থাকা শহর আমি আর একটাও দেখিনি।

স্টেশন থেকে বেড়িয়ে, দুজনে একটা রিকশায় বসলাম। সাহারানপুরের রিকশা যেমন হয়। বসবার সীট বিশেষ চওড়া হয় না। ওর বাড়ি স্টেশন থেকে প্রায় আধ ঘন্টার রাস্তা। সেই আধ ঘন্টা সময়টা আমার যে কি ভাবে কেটে ছিল তা এখানে আর লিখলাম না। আশা করি পাঠকেরা নিজ-গুনে তা বুঝে নেবেন।

প্রায় পৌনে-তিনটে নাগাদ ওর বাড়ি পৌঁছলাম। রিকশার ভাড়া দেওয়ার সময় (ভাড়াটা ওই দিয়েছিল) বাড়ির বাইরের সেন্সর লাইট জ্বলে উঠল। বাড়িতে ঢোকার আগেই বোঝা যাচ্ছিল খুব পরিপাটি বাড়ি। ছোট-ছোট চার-পাঁচটা সিড়ি। সিড়ির দুধারে ছোট-ছোট টবে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। আমার খুব রোমান্টিক লাগছিল। তার ওপর আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি তো ছিলই। যদিও তখনও কোনও প্ল্যান করিনি। কারন প্ল্যানিং-টা তো শুধু আমার একার উপর নির্ভর করছে না। তবে ও যে কিছু প্ল্যান করেছে সেটা বুজতে পারছিলাম এবং তা ভাবতে ভালই লাগছিল।

ও দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আমাকে ভেতরে আসতে বলল। আমি ওর পেছন পেছন করিডোর পেরিয়ে ভেতরে যখন ড্রইংরুমে পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ ও আমাকে শক্ত করে জাপটে ধরে "তাম্বি-তাম্বি" বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আমি তো অবাক। ও এত শক্ত করে আমাকে জাপটে ধরে ছিল যে আমি নিজেকে ছাড়াতেই পারছিলাম না। পরমুহূর্তেই ও অজ্ঞান হয়ে গেল। আমি সুটকেসটা মাটিতে রেখে, কোনমতে ওকে পাজাকোলা করে তুললাম। ওর ভারী শরীরটা তুলতে আমার কষ্টও হচ্ছিল, তবে ভাল লাগছিল এবং একটা অপূর্ব অনুভূতিও হচ্ছিল। ওকে কোথাও শোয়ানো দরকার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘরের ডানদিকে থাকা একটা সোফা দেখতে পেলাম। সেই সোফায় ওকে শুইয়ে দিয়ে, সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে খুব অবাক হয়ে ভীষন ভয় পেয়ে গেলাম।

দেখলাম দেওয়ালে টাঙানো বিরাট বড় আমার একটা ছবি। তাতে পরানো রয়েছে শুকিয়ে যাওয়া একটা মালা। দেওয়ালে টাঙানো আমার ছবিটা দেখে খুব ভয় তো পেয়েই ছিলাম তার সঙ্গে খুব হতভম্বও হয়ে গেলাম। মাথার সমস্ত দুষ্টু বুদ্ধি এক নিমেষে উধাও। কিছুক্ষন পরে ওর জ্ঞান ফিরে এল। আবার সেই "তাম্বি-তাম্বি" বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করল। ওর কান্না যেন আর থামতেই চাইছে না।

অনেক পরে ওর কান্না থামলে ওর কাছ থে যা জানতে পারলাম তা হলঃ

বসুন্ধরা ওর বাবা মায়ের সবচেয়ে বড় সন্তান। ওরা ছিল এক ভাই, এক বোন। ওর যখন আঠেরো বছর এবং ওর ভাইয়ের বয়স সাত, তখন ওদের বাবা-মা দুজনেই পুনা থেকে বোম্বে ফেরার পথে car accident-এ মারা যান। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর বসুন্ধরাই ওর থেকে এগারো বছর ছোট ওর ভাই বাসুদেবকে অনেক struggle করে মানুষ করেছিল এবং বাসুদেবের পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিল। বাসুদেব পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল। ১৯৭০-সালে বাসুদেব যখন Madras IIT-তে থার্ড ইয়ারে পড়ে, তখনই নকশাল আন্দোলনে ভুমিকা নেওয়ার জন্যে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। আর দেওয়ালের যেই ছবিটা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম, সেটা আমার নয়, বাসুদেবের—যাকে দেখতে অবিকল আমার মত।

তামিল ভাষায় ছোট ভাইকে তাম্বি বলে।

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন

অভিজিৎ দাস

[এই নিবন্ধে যে সব স্থানে ‘কা, প্র, পৃষ্ঠা সংখ্যা’ উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, প্রথম খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬-এর, যেখানে যেখানে ‘কা, দ্বি, পৃষ্ঠা সংখ্যা’ উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩-এর এবং যে সব জায়গায় ‘রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা’ দেওয়া আছে, সেগুলি রাজশেখর বসু-কৃত মহাভারতের সারানুবাদ, অষ্টম মুদ্রণ, ১৯৭৯-র]

কুন্তীর গর্ভে পবনদেবের ঔরসে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের জন্ম হয়। পৈতৃক সূত্রে তাই তিনি আর এক পবননন্দন হনুমানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা [হনুমানের মাতার নাম অঞ্জনা]। তবে তাঁর নৃশংস আচার-আচরণ ও শক্তির দম্ভের জন্য ভীম হনুমানের মত আরাধ্য দেবতার আসনে কোনোদিনই উন্নীত হতে পারেননি।

সদ্যোজাত ভীম যখন কুন্তীর ক্রোড়ে নিদ্রামগ্ন ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর কথা ভুলে বাঘের ভয়ে কুন্তী উঠে দাঁড়ান এবং ভীম একটি শিলাখণ্ডের উপর পতিত হন। তাতে ভীমের কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু শিলাখণ্ডটি তাঁর ভারে চূর্ণ হয়ে যায় [কা, প্র, পৃষ্ঠা ১৭৬]। তাই দেখে স্তম্ভিত পাণ্ডু তাঁর এই ক্ষেত্রজ পুত্রটির নাম রাখেন ভীমসেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ভীমকে বলেছেন ‘রক্তপ রাক্ষস’। বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষরক্তপান দেখে ভীমকে নরপশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এই ভীমই ছিলেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রধান কারণ। এটা এই নিবন্ধটি পড়লেই বোঝা যাবে।

পাণ্ডু ও মাদ্রীর পরলোক-গমনের সতেরো দিন পর পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে নিয়ে কয়েকজন মুনি হস্তিনাপুরে আসেন। সংক্ষেপে সেই পঞ্চপাণ্ডবদের ‘পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র’ বলে পরিচয় দিয়ে সেই মুনিরা জলস্পর্শ না করেই চলে যান [কা, প্র, পৃষ্ঠা ১৮০]। কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই ভীষ্মের অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্র সেই পাঁচটি ছেলেকে পাণ্ডুপুত্র ধরে নিয়ে নিজ পুত্রদের সমান মর্যাদা ও আদরে বড় করতে থাকেন। সেই সময় যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোল, ভীমের পনেরো, অর্জুনের চোদ্দ আর নকুল ও সহদেবের তেরো [রা, পৃষ্ঠা ৫১]। অর্থাৎ কেউই শিশু নয়। কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, সেটা না বোঝার মত বয়স কারুরই ছিল না।

দুধকলা দিয়ে ভীমের মত একটি কালসাপ পোষার উপযুক্ত পুরস্কার ধৃতরাষ্ট্রকে ভীম দিয়েছিলেন ন্যায় বা অন্যায় যুদ্ধে তাঁর সবকটি পুত্রকে হত্যা করে। এছাড়া ধৃতরাষ্ট্র আর একটি বড় ভুল করেন কুন্তীদের থাকার ব্যবস্থা পাণ্ডুর মহলে করে। এর ফলেই ধৃতরাষ্ট্রের পর নিজ পুত্রদের হস্তিনাপুরের মসনদে বসানোর বাসনা বা উচ্চাশা কুন্তীর মনে জন্ম নেয়, যেটা আবার চারিত হয় পঞ্চপাণ্ডবের মনেও। কিন্তু তাঁদের সেখানে বসার সবচেয়ে বড় বাধা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা। সম্ভবতঃ সেই কারণেই কৈশোরকালে হস্তিনাপুরে ধার্তরাষ্ট্রদের উপর ভীম নির্দয় অত্যাচার চালাতেন, কারণ সেই সময় তাঁরা কেউ পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি কোনোরকম দুর্ব্যবহার করেছেন বলে মহাভারতে উল্লেখ নেই। দুটি উদাহরণ দিলেই পাঠক পরিচয় পাবেন ভীমের সেই সুবিপুল পাশবশক্তির। সদ্যোজাত অবস্থায় শিলাখণ্ডের উপর তিনি পড়ায় সেটি চূর্ণ হওয়ার ঘটনা তো আগেই লিখেছি। অন্যটি হল, জতুগৃহ দাহ করে পালানোর সময় ভীম কুন্তীকে স্কন্ধে এবং নকুল-সহদেবকে ক্রোড়ে নিয়ে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের হাত ধরে যখন ছুটে চলেছিলেন তখন তাঁর বক্ষাঘাতে বনরাজি ও তরুদল ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হচ্ছিল [কা, প্র, পৃষ্ঠা ২০৭]। এহেন ভীম যখন খেলার ছলে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দের আক্রমণ করতেন তখন যে তা কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করত, তা সহজেই অনুমেয়। ভীম তাঁদের মাথা ঠুকে রক্ত বার করে দিতেন, সজোরে মাটিতে ফেলে চুল ধরে এত জোরে টানতেন যে তাঁরা কেউ ক্ষতজানু, কেউ ক্ষতবিক্ষত আর কেউ বা ক্ষতস্কন্ধ হয়ে প্রাণভয়ে

চিৎকার করে কাঁদতেন। কাউকে কাউকে আবার সাঁতার কাটার সময় জলে ডুবিয়ে মৃতকল্প করে ছাড়তেন। তাঁরা ফল পাড়তে গাছে উঠলে ভীম গাছ নাড়িয়ে তাঁদের মাটিতে ফেলে দিতেন যার ফলে তাঁদের হাত-পা ভেঙে যেত [কা, প্র, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২]। যদি ভীম তাঁর সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইদের সঙ্গেও এই 'খেলা'গুলি খেলতেন তাহলে বোঝা যেত এটাই তাঁর স্বভাব। কিন্তু 'খেলা'গুলি তিনি খেলতেন কেবল ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গেই এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, যাঁদের পিতা তাঁদের আশ্রয় না দিলে মাতাকে নিয়ে তাঁদের পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তাঁকে বারণ করা দূরস্থান, যুধিষ্ঠিররা তাঁর এই নিষ্ঠুর 'খেলা'গুলি উপভোগ করতেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে। ধার্তরাষ্ট্রেরা রাজকুমার এবং আজন্ম সুখে-সম্পদে লালিত। নিয়ম-মোতাবেক যুদ্ধ হলে হয়তো ভীম তাঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি গদাযুদ্ধে ভীমের চেয়ে দুর্যোধনের পারদর্শিতা ছিল অনেক বেশি, যা স্বয়ং কৃষ্ণও স্বীকার করে গেছেন [কা, দ্বি, পৃষ্ঠা ৪৫৮]। কিন্তু ওই সব জান্তব মারামারিতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না বলে হেরে যেতেন ভীমের কাছে।

পাণ্ডুর এই ক্ষেত্রজ পুত্রদের কারুর বিরুদ্ধে রাজার কাছে সরাসরি অভিযোগ জানানোর রীতি বোধহয় হস্তিনাপুরের রাজপুত্রদের ছিল না। তা নাহলে তাঁরা ভীমের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ পিতাকে না জানিয়ে মাতা গান্ধারীর কাছেই কেবল জানাতেন কেন? এদিকে সুচতুরা কুন্তী এমনভাবে কৌরবজননীর মগজধোলাই করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর নিজ পুত্ররা ভীমের বিরুদ্ধে কিছু বললে গান্ধারী ভীমকে কিছু না বলে বরং তাঁদেরই তিরস্কার করতেন। এমনকি ধৃতরাষ্ট্রকেও কিছু জানাতেন না। [কুন্তীর চাতুর্য যখন গান্ধারী বুঝলেন তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তাঁর পুত্ররা সকলেই তখন ভীমের হাতে নিহত] এদিকে বাধা না পেয়ে ভীম আরো উদ্দাম হয়ে কৌরব কুমারদের নিয়ে 'খেলা'য় মাততেন। গান্ধারীর কাছে অভিযোগ জানালে তাঁর অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেত [ছেলেবেলায় ভীমের এই সব অত্যাচারই প্রধানতঃ পরবর্তীকালে দাবানলে রূপান্তরিত হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটায়। তবে অন্যান্য কিছু কারণও অবশ্যই ছিল]।

এমতাবস্থায় কৌরব রাজপুত্রদের আর কি করার আছে আত্মরক্ষার জন্য! পিতার কাছে অভিযোগ জানানো চলবে না। মাতা থেকেও না থাকার সামিল, কারণ বিমাতৃসুলভ আচরণই তিনি করে থাকেন। অনেক ভাবনাচিন্তা করে শেষে দুর্যোধন ভীমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটা উপায় বার করলেন, যাতে ভীমকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁর অত্যাচার বন্ধ হয়। গঙ্গার সন্নিকটে একটি উদ্যানে বেড়াতে গিয়ে তিনি ভীমের মিষ্টান্নে কালকূট বিষ মিশিয়ে দিলেন। তারপর ভীম অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাঁকে লতাপাশে বেঁধে তিনি জলে ফেলে দিলেন। দুর্যোধন জানতেন জলের মধ্যে নাগেদের দংশনে অচিরেই ভীম বিষমুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসবেন, কিন্তু এতে তাঁর ভালোরকম শিক্ষা হবে। ঘটনা ঠিক তাই হল। উপরন্তু নাগরাজ বাসুকি ভীমকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলে চিনতে পেরে তাঁকে প্রচুর ধনরত্ন দান করলেন এবং আট কুম্ভ অমৃত পান করালেন। এর ফলে ভীম দ্বিগুণ শক্তিধর হয়ে ফিরলেন বটে, তবে কৌরবদের উপর তাঁর অত্যাচার বন্ধ হল । এদিকে ভীমের প্রত্যাবর্তন ও সমস্ত ঘটনা জানার পরেই কৌরবদের ঘরশত্রু ও পাণ্ডবপ্রেমী বিদুর চারিদিকে রাষ্ট্র করে বেড়াতে লাগলেন যে, রাজত্ব পাওয়ার লোভেই দুর্যোধন ভীমকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। একটা কথা কেউ ভেবে দেখল না, রাজত্বের ব্যাপারে তো যুধিষ্ঠিরই দুর্যোধনের প্রধান প্রতিপক্ষ! তাহলে তাঁকে কিছু না করে হঠাৎ ভীমকে কেন দুর্যোধন মারতে চাইবেন? তাছাড়া ভীমকে হত্যা করাই যদি দুর্যোধনের উদ্দেশ্য হত, তাহলে তো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তরবারির এক আঘাতেই তা তিনি করতে পারতেন! ভীমের নৃশংসতার আর একটি কাহিনী বলছি।

মগধরাজ বৃহদ্রথ কাশীরাজের দুটি যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। গতযৌবন হয়েও তিনি পুত্রলাভ করলেন না। এই সময় একদিন তাঁর কানে এল, মহাত্মা কাক্ষীবান গৌতমের পুত্র উদারচেতা চণ্ডকৌশিক মুনি তপঃক্লান্ত হয়ে তাঁরই রাজ্যের একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একথা শুনেই দুই পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বৃহদ্রথ তাঁর কাছে এসে বিবিধ রত্ন দিয়ে তাঁকে পরিতুষ্ট করেন। সন্তুষ্ট হয়ে মুনি তাঁকে বর দিতে চাইলে রাজা তাঁর কাছে পুত্রসন্তান কামনা করেন। মুনি তাঁকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম দেন তাঁর কোনো <u>একজন</u> রানির খাওয়ার জন্য। দুই

রানি কিন্তু সেটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে খান। যথাসময়ে দুই রানি দুটি শরীরখণ্ড প্রসব করেন। সেই দুটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে মানবশরীরের একটি করে অঙ্গ অর্থাৎ এক চক্ষু, এক বাহু, এক পদ ও অর্ধ বদন-উদর-নিতম্ব। রানিদের নির্দেশে ধাত্রীরা সজীব সেই শরীরখণ্ড দুটিকে বাইরে ফেলে আসে। তাই দেখে জরা নামে এক মাংসলোভী রাক্ষসী সেই অর্ধশরীর দুটিকে সহজে বওয়ার জন্য যেই সংযোজিত করে, তখনই একটি পূর্ণাঙ্গ বীর কুমার উৎপন্ন হয়। জরা তখন মানবরূপ ধারণ করে শিশুটিকে নিয়ে বৃহদ্রথর কাছে এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলে, "রাজা, এখন তোমার পুত্রকে গ্রহণ কর"। দুই রানি তখন সাদরে তাকে নিয়ে স্তনদুগ্ধ পান করান। জরারাক্ষসীর দ্বারা সন্ধিত বা সংযোজিত বলে রাজা শিশুটির নাম 'জরাসন্ধ' রাখেন [কা, প্র, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১]।

জরাসন্ধ কালক্রমে প্রবল পরাক্রমী হয়ে উঠলেন। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তাঁর উপযুক্ত হাতে মগধের রাজ্যভার সমর্পণ করে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীসহ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। চণ্ডকৌশিক মুনির আশীর্বাদে জরাসন্ধ সমস্ত রাজাদের উপর প্রভুত্ব এবং মহাদেবের সাক্ষাৎ দর্শনের শক্তি লাভ করলেন।

মথুরাপতি কংসর সঙ্গে জরাসন্ধর দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিবাহ হয়। কৃষ্ণের হাতে কংসবধ হবার পর অস্তি জরাসন্ধকে বলেন তাঁর পতিহন্তাকে বধ করতে। ক্ষিপ্ত জরাসন্ধ তখন একটি গদা নিরেনব্বই বার ঘুরিয়ে তাঁর রাজধানী গিরিব্রজ থেকে মথুরার অভিমুখে নিক্ষেপ করেন। গদাটি নিরেনব্বই যোজন দূরে মথুরার সন্নিকটে একটি স্থানে এসে পড়ে। সেই থেকে স্থানটির নাম 'গদাবসান' হয়। তারপর থেকে অনবরত মথুরা আক্রমণ করে জরাসন্ধ কৃষ্ণকে অতিষ্ঠ করে তোলেন, যার ফলে কৃষ্ণ বাধ্য হয়ে রাজ্যপাট গুটিয়ে রৈবতক পর্বতের কাছে কুশস্থলীতে পালিয়ে গিয়ে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপন করে সেখানে আশ্রয় নেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানবের নির্মিত সভাটি হবার পর একদিন মহর্ষি নারদ সেটি পরিদর্শন করতে এলেন। সব দেখে তিনি যুধিষ্ঠিরকে একটি রাজসূয় যজ্ঞ করতে বললেন। সেই সময় কৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন বলে যজ্ঞের ব্যাপারে তাঁর মত জানার জন্য যুধিষ্ঠির দ্রুতগামী রথে একটি দূতকে তাঁর কাছে পাঠালেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে জরাসন্ধর সব কথা যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে বললেন, "মহাদেবের বরপ্রভাবে জরাসন্ধ ছিয়াশি জন রাজাকে গিরিব্রজে বন্দী করে রেখেছেন। আর চোদ্দ জন রাজাকে বন্দী করতে পারলেই তিনি সেই একশোজন রাজাকে মহাদেবের পায়ে বলি দেবেন। তখন তিনি অজেয় হয়ে উঠবেন। যদি তুমি যজ্ঞ করতে চাও, তাহলে আগে জরাসন্ধকে বধ করে সেই ছিয়াশি জন রাজাকে মুক্ত কর। তাহলে সেই রাজারা স্বাভাবিকভাবেই তোমার পদানত হবেন, আর তোমার রাজসূয় যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হবে। তবে সম্মুখযুদ্ধে সুরাসুরেরও ক্ষমতা নেই যে জরাসন্ধকে পরাজিত করে। কাজেই কৌশল করে মল্লযুদ্ধে তাঁকে বধ করতে হবে"।

কৃষ্ণের পরামর্শমত ভীম ও অর্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ নিজেও একই রকম বেশে তাঁদের সহগামী হলেন। তারপর নানাদেশ ঘুরে অবশেষে গিরিব্রজর প্রান্তস্থ চৈতক পর্বতের এক প্রাচীন শৃঙ্গ ভেঙে তাঁরা নগরে প্রবেশ করলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের উপদেশে একটি ব্রত উদযাপনের জন্য সেই সময় জরাসন্ধ উপবাসী ছিলেন। তবু তিন ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এলে সেই ক্লান্ত শরীরেই তিনি সিংহাসন থেকে নেমে তাঁদের পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। কৃষ্ণ বললেন, "আমার দুই বন্ধু মৌনব্রত অবলম্বন করে আছেন। আজ মধ্যরাত্রে তা ভঙ্গ হবে। সেইসময় যদি আপনি অতিথিশালায় আসেন তাহলে খুব ভাল হয়, কারণ আমাদের কিছু কথা আমরা নিভৃতে আপনাকে বলতে চাই"। জরাসন্ধ রাজি হলেন।

সেই কথা অনুযায়ী সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ মধ্যরাত্রে অতিথিশালায় এসে কৃষ্ণদের সঙ্গে দেখা করলেন। ইতিমধ্যে তিনি শুনেছিলেন কিভাবে কৃষ্ণরা গিরিব্রজে প্রবেশ করেছেন। তাই তিনি বললেন, "আপনাদের পোষাক ব্রাহ্মণের মত, কিন্তু হাতে দেখছি ধনুর্গুণের আঘাতচিহ্ন। আপনাদের সত্য পরিচয় দিন। আপনারা প্রধান দ্বার দিয়ে প্রবেশ না করে চৈত্যক পর্বতশৃঙ্গ ভেঙে অদ্বার দিয়েই বা কেন আমার কাছে এসেছেন?" কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "আমরা ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অদ্বার দিয়েই শত্রুর গৃহে প্রবেশ করে"। বিস্মিত জরাসন্ধ বললেন,

"আপনাদের সঙ্গে আমি কখনো শত্রুতা করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমায় শত্রু বলছেন কেন?" কৃষ্ণ বললেন, "তুমি ছিয়াশি জন রাজাকে বন্দী করে রেখেছ। নিজে ক্ষত্রিয় হয়েও মহাদেবের কাছে সেই ক্ষত্রিয় রাজাদের পশুরূপে বলি দিতে চাও বলেই তুমি আমাদের শত্রু। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ আর এঁরা দুই পাণ্ডুপুত্র। আমরা তোমায় মল্লযুদ্ধে আহ্বান করছি। হয় ওই রাজাদের মুক্তি দাও, নাহয় শমনসদনে যাও"।

"কৃষ্ণ, আমি ওই রাজাদের নিজ ক্ষমতায় পরাজিত করেছি এবং বাহুবলে যাকে পরাস্ত করা হয় তাকে নিয়ে যা খুশী করাই হচ্ছে ক্ষাত্রধর্ম। আমার ইষ্টদেবতার জন্য যাদের এনেছি, তোমাদের ভয়ে তাদের আমি ছাড়তে পারি না। তোমরা কি তিনজন একসঙ্গে আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে চাও?"

"তুমি আমাদের তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পার"।

কৃষ্ণর এই কথার উত্তরে জরাসন্ধ অর্জুনকে নির্বাচন করতে পারতেন, এবং সেক্ষেত্রে অর্জুনের পক্ষে মল্লযুদ্ধে তাঁকে হারানো সম্ভব হত না। মহাবল মগধরাজ কিন্তু সেরকম কাপুরুষোচিত মনোভাব না দেখিয়ে তাঁর তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভীমকেই বেছে নিলেন।

চোদ্দদিন একনাগাড়ে দুজনের মল্লযুদ্ধ হল। চতুর্দশ দিবসে রাত্রিবেলা □□□□□-ক্লান্ত মগধরাজ যখন কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত হলেন তখন সেই সুযোগে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম দানবীয় শক্তিতে তাঁকে দুহাতে তুলে শতবার ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে জানুদ্বারা পৃষ্ঠদেশ ভেঙে জরাসন্ধর পদদ্বয় দুহাতে ধরে টান মেরে তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত করে নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করলেন আর অর্জুন ও কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বীভৎস দৃশ্য উপভোগ করলেন। জরাসন্ধের আর্তনাদে ও ভীমের গর্জনে সেদিন মগধবাসী ত্রস্ত হয়, স্ত্রীদের গর্ভপাত হয় [রা, পৃ ১১১]। ভীমের নারকীয় স্বভাবের এটি আর একটি নজির। জরাসন্ধকে বধ করার পর তাঁর পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসিয়ে সমস্ত বন্দী রাজাদের মুক্তি দিয়ে কৃষ্ণসহ পাণ্ডবরা 'বিজয়গর্বে' ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন।

এই ঘটনায় অনিবার্যভাবেই কিছু কথা মনে আসে। প্রথমতঃ পরাজিত রাজাদের নিয়ে জয়ী নৃপতিরা যা ইচ্ছা করতে পারতেন সেযুগের ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী, যার জন্য জরাসন্ধর সেই যুক্তির বিরুদ্ধে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণও কিছু বলতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ গোপনে কারো অন্তঃপুরে ঢুকে ক্লান্ত, অব্যবস্থিত ও অসতর্ক গৃহস্থকে হত্যা করে পাণ্ডবরা কোন্ ক্ষাত্রধর্মের পরিচয় দিয়েছেন? জরাসন্ধ তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানো ছাড়া কোনোরূপ অসদাচরণ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রজাদের উপরেও কোনো অত্যাচার করতেন বলে শোনা যায় না। তৃতীয়তঃ ইচ্ছা করলেই জরাসন্ধ নিজ সেনাদের ডেকে ভীমদের তিনজনকে কচুকাটা করতে পারতেন। কিন্তু নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে বুঝেও বীরোচিত ধর্ম পালন করে তা তিনি করেননি। চতুর্থতঃ ছিয়াশি জন রাজার ঘটনাটা উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে নিজের পালিয়ে থাকা জীবন থেকে মুক্তি পেতেই কৃষ্ণ ভীমকে দিয়ে এই কুকর্মটি করিয়েছিলেন, কারণ সম্মুখসমরে তো বটেই, মল্লযুদ্ধেও জরাসন্ধকে পরাস্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এটা তিনি স্বীকারও করেছেন [কা, প্র, পৃষ্ঠা ৩০২]।

ভীমের পরবর্তী নৃশংস কাজ বিরাট রাজার [যাঁর কৃপায় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে এক বছর থাকতে পেরেছিলেন] শ্যালক কীচককে হত্যা। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর মধ্যে ভীমই তাঁকে সবচেয়ে ভালবাসতেন। তাই তাঁর অপমান সহ্য করতে না পেরে ভীম এই হত্যাকার্যটি করেন। এটা নাহয় বুঝলাম যে, স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি কীচককে মারেন। কিন্তু মারার পর কীচকের হাত-পা-মাথা-গলা ইত্যাদি সবই দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াটাকে নারকীয়তা ছাড়া আর কীই বা বলা যায়! [কা, প্র, পৃষ্ঠা ৭০৫]

এরপর কিভাবে কুরুক্ষেত্রের মহারণ শুরু হল, সেই বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে চলে যাচ্ছি যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে। ভীষ্ম ও দ্রোণের পতনের পর মহাবীর কর্ণ তখন কৌরব সেনাপতি। যুদ্ধরত দুঃশাসন ও ভীম পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। ভীমের শরাঘাতে দুঃশাসনের ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন হল। তারপর তাঁর ললাটে একটি শর নিক্ষেপ করে সুতীক্ষ্ণ আর একটি বাণে ভীম তাঁর সারথিরও মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। তখন দুঃশাসন অন্য একটি শরাসন গ্রহণ করে নিজেই রথ চালাতে চালাতে দ্বাদশশরে ভীমকে বিদ্ধ করলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত আর একটি ভীষণ শরে বিদ্ধ হয়ে ভীম অচেতন হয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে তদ্দণ্ডেই দুঃশাসন তাঁকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু কাপুরুষোচিত সেই কাজটি না করে তিনি ভীমের জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সংজ্ঞালাভ করার পর ভীমের গদাঘাতে দুঃশাসন মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। তখন ভীম কিন্তু সেই প্রায়-অচেতন দুঃশাসনের সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না – দুঃশাসনের গলায় পা দিয়ে তীক্ষ্ণ অসির সাহায্যে তাঁর বুক চিরে ভীম সেই বক্ষরক্ত পান করতে করতে বললেন, "স্তন্যস্য মাতৃর্মধুসর্পিষোর্বা মাধ্বীকপানস্য চ সৎকৃতস্য। দিব্যস্য বা তোয়রসস্য পানাৎ পয়োদধিভ্যাং মথিতাচ্চ মুখ্যাৎ।। অন্যানি পানানি চ যানি লোকে সুধামৃতস্বাদুরসানি তেভ্যঃ। সর্বেভ্য এবাধিকো রসোহয়ং মতো মমাদ্যাহিতলোহিতস্য।।" অর্থাৎ, 'মাতার স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তম মাধ্বীক সুরা, দিব্য জল, মথিত দুগ্ধ ও দধি এবং অন্যান্য অমৃত-সমান যত পানীয় জগতে আছে, সেই সব কিছুর চেয়ে আজ এই শত্রুশোণিত আমার অধিক সুস্বাদু বোধ হচ্ছে' [রা, পৃষ্ঠা ৪৯৯]। কতটা নির্মম, নিষ্ঠুর, নরাধম ও পাশবিক হলে একজন নিজের জাঠতুত ভাইয়ের বক্ষরক্ত পান করতে পারে আর সেটা করার পর এই কথা বলতে পারে, একবার ভেবে দেখুন। দ্রৌপদী তাঁকে বলেছিলেন দুঃশাসনের রক্তেই কেবলমাত্র তাঁর বেণীবন্ধনকরবেন, নচেৎ করবেন না – বক্ষরক্ত পান করতে তো বলেননি!

এরপর আমরা পাই দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের ঘটনা। অন্যায় গদাযুদ্ধে তাঁর নাভির নীচে আঘাত করে ভীম তাঁর ঊরুভঙ্গ করেন। দুর্যোধন মাটিতে পড়ে গেলে ভীম তাঁকে বারংবার বামপদাঘাত করেন, এবং যদি যুধিষ্ঠির তাঁকে তিরস্কার করে বাধা না দিতেন, তাহলে সেইভাবেই দুর্যোধনের প্রাণবায়ু নির্গত করার বাসনা তাঁর ছিল। ভীমের এই অন্যায় যুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্যর ঊরুভঙ্গ ও ভীমের তাঁকে পদাঘাত দেখে বলরাম ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বধ করতে গেলে সুচতুর কৃষ্ণ বাকজাল বিস্তার করে কোনোরকমে তাঁকে আটকান। তানাহলে এই নরাধম ব্যক্তিটির সেদিনই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত ছিল।

বলদর্পী ভীমের দর্প দুবার চূর্ণ হয়। প্রথমবার হয় হনুমানের কাছে। দ্রৌপদীর যত আবদার ছিল ভীমের কাছে। আর তিনি কিছু চাইলে যত বাধাই আসুক না কেন, ভীম সেটা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। একবার কাম্যকবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দ্রৌপদী ভীমকে বেশ কিছু সহস্রদল পদ্ম আনতে বলেন। সেই পদ্ম খুঁজতে খুঁজতে ভীম ভুল করে স্বর্গের পথে এসে পড়েন। তখন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাবার জন্য হনুমান পথের মাঝে শুয়ে পড়েন। ভীম তাঁকে সরে যেতে বললে তিনি বললেন, "আমি রুগ্ন, ওঠার ক্ষমতা নেই। তুমি বরং আমাকে ডিঙিয়ে যাও"। ভীম বললেন, "নির্গুণ পরমাত্মা যদি দেহ জুড়ে না থাকতেন, তবে আমি তোমায় ডিঙিয়ে যেতাম। যদি না সরো, তাহলে যমালয়ে পাঠাব"। হনুমান বললেন, "তাহলে আমার লেজটি সরিয়ে তুমি চলে যাও"। বানরটিকে বধ করার উদ্দেশ্যে ভীম তাঁর লেজ ধরে ঘুরিয়ে মারার চেষ্টা করলেন, কিন্তু লেজটিকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে হনুমান নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন, "তুমি মানুষের অগম্য পথে এসে পড়েছিলে বলেই আমি তোমায় আটকেছিলাম। তুমি এটা কখনোই গর্ব কোরো না যে, তোমার চেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই"। তারপর গন্ধমাদন পর্বতের উপর দিয়ে হনুমান-নির্দেশিত পথে গিয়ে ভীম সহস্রদল পদ্ম সংগ্রহ করে ফিরে যান।

দ্বিতীয়বার ভীমের দর্পচূর্ণ হয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর যুধিষ্ঠিরেরা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে প্রণাম করতে যান। সেদিন যদি সুচতুর কৃষ্ণ লৌহভীম-মূর্তি ধৃতরাষ্ট্রের সামনে না রেখে আসল ভীমকে তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেন, তাহলে সেই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা শুধু আলিঙ্গন করেই ভীমকে পিষ্ট করে ফেলতেন। অমিত বলশালী রাজা সেই লৌহভীমকেও আলিঙ্গন করে চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। দেখে ভীমের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল।

মনে মনে বোধহয় কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছিলেন কৃষ্ণকে। সেই রাগে পরবর্তীকালে ভীম অনুচরদের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করাতেন এবং পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্যদের বলতেন, তাঁর চন্দনচর্চিত পরিঘসম বাহুর দ্বারাই এই বৃদ্ধ রাজার সবকটি পুত্রকে যমালয়ে পাঠিয়েছেন। এই মানসিক কষ্ট আর উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরেই ধৃতরাষ্ট্র কিছুদিন পরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন [রা, পৃষ্ঠা ৬৫৪]।

মহাপ্রস্থানের পথে যখন ভীমের পতন হল তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁর পতনের কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে যুধিষ্ঠির তাঁকে বলেন, ‘‘তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু না দিয়ে নিজে অপরিমিত আহার করতে ও নিজেকে অদ্বিতীয় বলশালী বলে অহংকার করতে। এইজন্যই তোমার পতন হল’’ [কা, দ্বি, পৃষ্ঠা ১২৪৩]।

বিবেকানন্দের বিশ্বজয়

অমিত সেনগুপ্ত
(অকল্যান্ড)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জনে সেবিছে ঈশ্বর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করবার এবং তাঁর চিন্তার বীজ বিশ্বব্যাপী বপন করার ও ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর যে মহান ও প্রধান শিষ্যের উপর ন্যস্ত ছিল, সেই স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন দেহ ও মনের দিক থেকে ঠাকুরের ঠিক বিপরীত। ছোট বয়স থেকেই বিবেকানন্দ, অর্থাৎ তখনকার নরেন, দাম্ভিক প্রকৃতির ছিলেন। এ দম্ভ রামকৃষ্ণের সামনেও অনেকবার প্রকাশ পায়। তাই সেই সময় মাঝে মাঝে ঠাকুরকেও ভালবাসার সুরে বলতে শোনা গেছে "আরে লরেন (তিনি লরেন বলতেন, নরেন নয়) আমাকে পর্যন্ত মানতে চায় না।" তবে তখনই তিনি এও বলেছিলেন--"লরেন যেদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের স্পর্শে আসবে, ওর এই দম্ভ করুণায় বিগলিত হবে, ওর সব আত্মবিশ্বাস অন্যের হতাশ ভীরু আত্মার মধ্যে বিশ্বাস ও সাহস ফিরিয়ে আনবার হাতিয়ার হয়ে উঠবে।"

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর বরানগরের মঠে কয়েক মাস তাঁর শিষ্যরা পরস্পরের মানসিক উন্নতি সাধনে অতিবাহিত করলেন। তখন তাঁরা কেউই মানুষের কাছে ঠাকুরের বাণী পৌছে দেবার উপযুক্ত অবস্থায় ছিলেন না। প্রথম কয়েক মাস তাঁরা মুক্তির সন্ধানে ধ্যান-ধারণার মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন। নরেনের কাছে স্বপ্ন ও কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাই তিনি গুরুভাইদের শুধু নিষ্ক্রিয় ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হতে দিলেন না, কাউকেই ভগবৎ-চিন্তার আলস্যে গা ঢালবার সুযোগ দিলেন না। যদিও রামকৃষ্ণর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বয়সে তাঁর থেকে বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা প্রথম থেকেই তাঁর গুরুভাইদের পথ দেখাবার অধিকার দিল। সাধে কি ঠাকুর বিদায়কালে নরেনকে বলেছিলেন, 'এদের দেখিস'। আর অসুস্থতার শেষ দশায় কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নড়বড়ে হাতে লিখেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন দূরে বাহিরে হাঁক দিবে'।

নরেনের কোন সন্দেহই ছিল না যে এক মহান কর্তব্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ১৮৮৮ সালে হঠাৎ তিনি কোলকাতা ত্যাগ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন। এর পরও তিনি আরও কয়েকবার এইভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণে যান, দেশটাকে ভালভাবে দেখে-বুঝে নেওয়ার জন্যে। এই পরিভ্রমণের বর্ষগুলো ছিল শিক্ষালাভের বর্ষ। অপূর্ব শিক্ষা। তিনি দীন-দরিদ্রের মধ্যে থেকে তাদের জীবনে অংশ গ্রহণ করেছেন, জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখলেন মানুষের মধ্যে ভগবান কীভাবে সংগ্রাম করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেও এ শিক্ষা পাওয়া যায় না। ঠাকুরের সঙ্গে থেকে এই শিক্ষা আভাসে-ইঙ্গিতে স্পষ্ট-অস্পষ্টভাবে যেন স্বপ্নের মতই পেয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের সাথে মিশে তাদের দৈন্য ও লাঞ্ছনায় অংশ গ্রহণ করলেন। এই সময় তিনি কিছুদিন একটি পতিত মেথর পরিবারে বাস করেন। এসব মানুষ, যারা সমাজের নিচে নত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক সম্পদের

সন্ধান পেলেন। তাদের দুঃখদৈন্য ও দুরবস্থা তাঁর শ্বাসরোধ করল। তিনি কেঁদে উঠলেন, "ওরে আমার দেশ! আমার দেশ!..." নিজের বুক চাপড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা কি সন্ন্যাসী, আমরা নাকি ভগবানের ভক্ত, আমরা এদের জন্য কি করেছি?" ঠাকুরের কথা মনে পড়ল, "ওরে, খলি পেটে ধর্ম হয় না!"

ধর্মের আত্মসর্বস্ব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বিবেকানন্দের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। তিনি ধর্মের প্রথম কর্ত্তব্য ঘোষণা করলেন, "দীনদুঃখীর যত্ন করো, তাদের সেবা করো, তাদের অবস্থার উন্নতি করো।" এর দায়িত্ব, তিনি বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত, ধনী, রাজকর্মচারী, রাজামহারাজ সকলের উপর ন্যস্ত করলেন, "আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যিনি অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে পারেন? বেদান্তপাঠ ও ধ্যানের সাধনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখুন! এ শরীর অপরের সেবায় উৎসর্গ করুন। তা হোলেই জানব আপনারা বৃথা আমার কাছে আসেন নি। মনে রাখুন সর্ব জীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানকেই আমি বিশ্বাস করি। এরাই আমার ভগবান। এই ভগবানের জন্য বার বার আমি জন্মিতে পারি। এদের সেবাই ভগবানের প্রকৃত সেবা। সত্যিকারের ধর্ম করতে যদি চান তো এদের সেবা করুন।"

বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন, "আমি এমন একটা ধর্ম চাই যা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দেবার, আমাদের চতুর্পার্শ্বের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করবার শক্তি এনে দেবে। যদি ভগবানকে পেতে চাও তো দরিদ্র মানুষের সেবা করো। তাহারা হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই জনসাধারণই তোমাদের ভগবান হইয়া উঠুক। যতদিন কোটি কোটি মানুষ অনাহারে অজ্ঞানতায় থাকিবে ততদিন প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব - কারণ তাহারা দরিদ্রের অর্থে নিজেদের শিক্ষিত করিয়াছে, অথচ দরিদ্রের প্রতি তাহাদের বিন্দু মাত্র লক্ষ্য নাই। "

১৮৯২ সালের পরিভ্রমণে, সারা ভারতময় যে দুঃখ-দুর্দশা বিবেকানন্দ দেখলেন, তাইই তাঁর সমস্ত মন জুড়ে রইল, সেই মনে আর অন্য কোনও চিন্তা রইল না। বাঘ যেমন শিকারের সন্ধান করে, তিনিও ঠিক সেইভাবে এর সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। সেই মুহূর্ত্ত থেকে দীন-দুঃখী মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। তাঁর দেহ ও আত্মাকেও উৎসর্গ করলেন। কিন্তু নিঃস্ব সন্ন্যাসী তিনি, কিভাবে এদের সাহায্য করতে পারেন? ভাবলেন দু-চার-দশজন যে পরিচিত রাজা মহারাজা আছেন, তাঁদের দান দিয়ে এই প্রয়োজন মিটবে না। তখন তিনি কন্যা-কুমারিকায়। তাকালেন বিশাল সমুদ্রের দিকে, তাকালেন সমুদ্রপারের দেশগুলির দিকে। স্থির করলেন সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি আবেদন জানাবেন। ভারতকে যে সমস্ত বিশ্বেরই চাই।

১৮৯২-এর শেষ দিকে বিবেকানন্দ শুনলেন যে আগামী বছর শিকাগোতে সর্ব-ধর্ম-সম্মেলন হবে। আসবেন সারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষ। শুনেই তিনি দৃঢ় নিশ্চয় করলেন যে যেভাবেই হোক তাঁকে সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু যাবেন কি ভাবে? তাঁর পরিচিত ধনী ব্যাঙ্কের মালিক ও রাজা মহারাজারা টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু সে টাকা তিনি নিলেন না। তিনি বললেন, "আমি জনসাধারণ ও দীন-দুঃখীর পক্ষ থেকে যাচ্ছি।" তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের (যারা অর্থ সংগ্রহ করছিলেন) বিশেষভাবে মধ্যবিত্তের কাছেই আবেদন করতে বললেন। অর্থও সংগ্রহ হোল।

এর পর ৩১শে মে বিবেকানন্দ বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়লেন। এই যাত্রার সময় থেকেই তিনি তাঁর লাল রেশমের পোশাক ও গেরুয়া পাগড়ী ব্যাবহার করতে থাকেন। এই সময়ই তিনি বিবেকানন্দ নামটি গ্রহণ করেন। নামটি তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রীর মহারাজা দেন। ভারত ভ্রমণকালে তিনি ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম গ্রহণ করতেন, যাতে লোকচক্ষে ধরা না পড়েন। ১৮৯২ সালে পুনাতে বাল গঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে তিনি দশদিন ছিলেন। কিন্তু তিলক তাঁর নাম জানতে পারেন নি।

জুলাইয়ের শেষের দিকে বিবেকানন্দ শিকাগো পৌঁছে শুনলেন, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে ধর্ম-সম্মেলন শুরু হবে। তা ছাড়া প্রতিনিধি হিসাবে নাম লেখাবার তারিখও অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আর শুধু তাই নয়, সরকারী পরিচয়পত্র না থাকলে নাম লেখান চলবে না। তিনি কোনো অনুমোদিত দলের সুপারিশ নিয়ে আসেন নি। তাছাড়া টাকা-পয়সাও প্রায় শেষ হতে চলেছে। যে কটা ডলার তাঁর সঙ্গে ছিল, তা খরচ করে তিনি অপেক্ষাকৃত সস্তা শহর বোস্টনে গেলেন।

বিবেকানন্দের মত লোক কখনও লোকের নজরে না পড়ে পারেন না। বোস্টনে যাবার সময় ট্রেনে তাঁর চেহারা আর কথাবার্তা এক ধনী বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে মুগ্ধ করল। তিনি বিবেকানন্দকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং হার্ভার্ড

ইউনিভারসিটির অধ্যাপক জন রাইটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যাপক রাইট এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান ও প্রতিভা দেখে অবাক হলেন। তিনি সব রকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি এই কপর্দকশূন্য তরুণ সন্যাসীকে শিকাগো যাবার রেলের টিকিট কিনে দিলেন ও থাকবার জায়গা ঠিক করে দেবার জন্য কমিটির প্রেসিডেন্টের (যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন) কাছে চিঠি লিখে দিলেন। এছাড়া নিজের তরফ থেকেও কয়েটি পরিচয়পত্র লিখে দিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন "তোমাদের সম্মেললেন সমস্ত প্রতিনিধিদের জ্ঞানের সমষ্টি যদি একটা প্রদীপের আলোর সমান হয়, তবে এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান সূর্যের সমান।" প্রফেসর রাইটের কথা মিথ্যে হয় নি।

অনেক রাত্রে বিবেকানন্দ শিকাগো স্টেশনে পৌঁছলেন। রাত্রে কোনভাবে স্টেশনে কাটিয়ে, সকালে ক্লান্ত হয়ে তিনি পথে বসে পড়লেন। পথের ওপারের এক ভদ্রমহিলা তাঁকে লক্ষ্য করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তিনি সম্মেলনের কোন প্রতিনিধি কিনা। বিশ্রামের পর তিনি তাঁকে সম্মেলনের অফিসে নিয়ে গেলেন। প্রতিনিধি হিসাবে বিবেকানন্দ সাদরে গৃহীত হলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার শিকাগোতে সর্ব-ধর্ম-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হল। সমস্ত প্রতিনিধিদের ঠিক মাঝেখানে বসে আছেন কার্ডিনাল গিবসন, যিনি এই ধর্ম-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে বসে আছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা। বিবেকানন্দ বিশেষ কারও প্রতিনিধিত্ব করতেও আসেন নি - আবার সকলেরই প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন। তিনি ভারতের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নন। তিনি ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি। হাজার হাজার উপস্থিত দর্শকের দৃষ্টি এই সুদর্শন, বলিষ্ঠ, তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর উপর পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, কমনীয় মাধুর্য ও মহিমা, তাঁর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার শুরুতেই শ্রোতাদের মুগ্ধ করল। তাঁর সুন্দর মুখ-মন্ডল, সমুন্নত দেহ, পোশাক – সবকিছুই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এই ধরনের সভায় বিবেকানন্দ এই প্রথম বলতে এসেছেন। একে একে সব প্রতিনিধিরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। বিবেকানন্দ লিখিত কোন কিছুই নিয়ে যাননি। সব শেষে তাঁর পালা আসলে তিনি উঠলেন। দুই হাত বুকের সামনে রেখে (যা তাঁর বিখ্যাত ছবিতে দেখা যায়) সম্বোধন করলেন, 'সিস্টারস্ এন্ড ব্রাদারস্ অফ আমেরিকা' বলে।

বক্তৃতার শুরুতে এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে সমবেত সাত হাজার শ্রোতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন। সেই হাততালি চলল মিনিট দুই। তার পর বিবেকানন্দের বক্তৃতা চলল বেশ কয়েক ঘন্টা - সন্ধ্যে পর্যন্ত। তাঁর সেই বক্তৃতা ছিল যেন অগ্নি-শিখা। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যে ধর্ম বরাবর পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত পার্থক্য স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, সেই ধর্মভূক্ত বলে আমি গৌরব বোধ করি। আমরা সব ধর্মকেই স্বীকার করি। শুধু তাই নয় সব ধর্মই আমাদের চোখে সমান সত্য।..... ইংরাজী exclusion শব্দটিকে যে ধর্মের ভাষায় (মানে সংস্কৃতে) অনুবাদ অবধি করা যায় না, সেই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত মানুষ বলে আমি গর্বিত।" এর পরে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে "পৃথিবীর সব ধর্মের, সব জাতির পীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে চিরকাল অকাতরে বুকে টেনে নিয়েছে, সহায় ও শরণ দিয়েছে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু ধর্ম। ইহুদি ও পারসীরা তাঁদের ধর্মে আক্রমণকারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছে। আমি গর্ব অনুভব করি এমন ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে। ..... আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হোক। প্রভুর জয় হোক।"

প্রফেসর রাইট যে মিথ্যা বা ভুল বলেন নি, উপযুক্ত কথাই লিখেছিলেন তার প্রমাণ স্বামীজী দিলেন। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়, "অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিষ্প্রাণ তত্ত্বালোচনার ধূসর প্রান্তরে তাহা সমবেত মানুষের অগণিত আত্মায় আগুন ধরাইয়া দিল।" শিকাগোতে এই সর্ব-ধর্ম-সম্মেলনের সভায় মাত্র ত্রিশ বছরের বিবেকানন্দই ছিলেন সর্ব-কনিষ্ঠ প্রতিনিধি। সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত-পরিচয় এই তরুণ সন্ন্যাসীর আত্মপ্রকাশে অন্যান্য সভ্যদের কথা মানুষ ভুলে গেল। অন্যান্য বক্তারাও কিন্তু সবাই ভগবানের কথাই বলেছিলেন - কিন্তু সে ভগবান ছিলেন তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভগবান। স্বামী বিবেকানন্দই কেবলমাত্র একা সকলের ভগবানের কথা বললেন, সকলের ভগবানকে বিশ্ব-সত্ত্বায় মিলিয়ে দিলেন। এ ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তা তাঁর মহান শিষ্যের মুখ দিয়ে নির্গত হোল। বিবেকানন্দ বললেন, "খ্রীষ্টানকে বা মুসলমানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হোতে হবে না, হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রীষ্টান বা মুসলমান হোতে হবে না। সবাই অপরের অধ্যাত্ম আলোক অধিগত করবেন, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাবেন না, বিকাশের মূলনীতি অনুসারে সকলেই

বিকাশ লাভ করবে। প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লেখা থাকবে "সাহায্য করো সংগ্রাম নয়, গ্রহণ করো ধংস নয়, লিখিত থাকবে - মতানৈক্য নয় মতৈক্য ও শান্তি।" তাঁর বক্তৃতা শুনে সম্মেলনে উপস্থিত এক ইহুদী ধার্মিক পণ্ডিত মন্তব্য করেন, "স্বামীজির বক্তৃতা শোনার পর জীবনে প্রথমবার আমার মনে হল আমার ইহুদী ধর্মও সত্য, এবং তারপর থেকেই আমি আমার ধর্মকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করতে শিখি।"

এর পরবর্তী কয়েকদিনে বিবেকানন্দ আরও দশ-বারো বার বক্তৃতা দিলেন। তিনি মঞ্চে উঠলেই, বক্তৃতা শুরু হবার আগেই শ্রোতারা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে উঠতেন। সম্মেলনের অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের উৎসাহের ভাটা পড়তে দেখলেই শ্রোতাদের শেষ পর্যন্ত বসিয়ে রাখার জন্য বলা হত বিবেকানন্দ শেষে বক্তৃতা দেবেন। সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি এসেছিলেন, বিবেকানন্দের কথাগুলি তাঁদের ডিঙিয়ে সর্বসাধারণের জন্য উচ্চারিত হল যা অন্য ধর্মের অনেক লোকেদেরও আবেদন করল। বিবেকানন্দের খ্যাতি অচিরেই দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

সমস্ত মার্কিন সংবাদপত্র একবাক্যে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিবেকানন্দকেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে স্বীকার ও ঘোষণা করল। বলল, 'তাঁর বক্তৃতা শুনবার পর ভারতের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা যে কিরূপ নির্বুদ্ধিতার কাজ তা আমরা অনুভব করলাম।'

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাধারায় যে ভাবের কাজ চলছিল, তার ফলে পাশ্চাত্যের অন্যন্য যে কোনো দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রই বিবেকানন্দকে গ্রহণ করার পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রচার শুরু করতে না করতেই তাঁর বাণী শোনার জন্য তৃষ্ণার্ত নরনারী তাঁর চতুর্দিকে ভীড় করে আসলো। তারা চারিদিক থেকে আসতে লাগল। এলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা, এলো অকপট শুদ্ধচেতা খ্রীষ্টানরা, স্বাধীনচেতা মনীষীরা, এমন কি সংশয়বাদীরাও।

রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, "তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সকলেই প্রথম দর্শনেই তাঁর মধ্যে ভগবৎ-প্রেরিত এক নেতার সাক্ষাৎ পেত। তাঁর মধ্যে নির্দেশ দেবার, পরিচালিত করবার যে শক্তি ছিল তা সকলের চোখেই ধরা পড়ত।"

এর পরের ঘটনা বা ইতিহাস আমরা জানি। অথচ, স্বামীজীকে কতটা সম্মানই বা আমরা দিয়েছি। তাঁর জীবিত অবস্থায়, যে দক্ষিণেশ্বর তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় তীর্থস্থান, সেই দক্ষিণেশ্বর-মন্দির তাঁর প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ তিনি সমুদ্র পার হয়েছিলেন, সাহেবদের সাথে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। আর, তিনি কি করেছেন আমাদের জন্যে? গোটা জাতিটাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। শুধু জাগিয়েই তোলেন নি, পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের জন্যে একটা সম্মানের আসন তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "If you want to know about India, study Vivekananda." আর এ সব উনি করেছেন সেই যুগে, যখন বিদেশীরা তো বটেই, আমরা নিজেরাই ভারতবর্ষকে ছোট চোখে, ঘৃণার চোখে দেখতাম। ধর্মের বেড়া তাঁকে চিন্তিত করবে এমন মানুষ তিনি ছিলেন না। তাই তিনি এই মহান সত্য ঘোষণা করেছিলেন, "কোনো একটি ধর্মের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু কোনো একটি ধর্মের মধ্যে মরা - সে ভয়ংকর।"